## ৭৫ এর কিছু স্মৃতি; কর্নেল তাহের, অসমাপ্ত বিপ্লব না ভূল তত্ত্বের পরিনতী?

**দুরের সকালঃ** মধ্য রাত থেকেই গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু ভোরের দিকে মনে হচ্ছিল বাসার সামনেই প্রচন্ড গোলাগুলি হচ্ছে। আরো একটু সকাল হলে ব্যালকনি থেকে দেখলাম, বাসার সামনে বেশ কয়েকটি মিলিটারী ট্রাক এবং দুই বাসা পরে ৩৩৬ এলিফ্যান্ট রোড'এর সামনে প্রচন্ড ভীড়! বিদ্রোহী সৈনিক'রা অটোমেটিক অস্ত্রের ফাকা গুলি করে উল্লাস প্রকাশ করছিল।

এর কয়েক বছর আগে, ৩৩৬ আসেন নতুন ভাড়াটিয়া, কর্নেল তাহের (অবসরপ্রাপ্ত), বীর উত্তম! মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে যোগ দেন যুদ্ধে এবং একটি পা হারান মুক্তিযুদ্ধে। স্বাধীনতার পর কিছুদিন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট'এ ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন তিনি। পরে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন এবং ড্রেজার সংস্থার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। সাধারনত নারায়নগঞ্জ এ থাকতেন। বাসায় প্রধানত থাক তো আমাদের চেয়ে পাচ ছয় বছরের বড়, উনার দুই ছোট ভাই, বাহার ও বেলাল। দুই বীর প্রতীক!

১৯৭৫ সালের ৭ ই নভেম্বর সকালে এই বাড়িটি ই হয়েছিলো বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু! বাড়িটি ছিল আমার পাড়া ও নটরডেম কলেজের বন্ধু ইফতেখার উজ্জ জামান, তুহিন'(আবাহনী'র হকি খেলোয়ার) দের। একটু পরে কর্নেল তাহের এর বাড়ি'র সামনে গেলাম, ঘটনা কি জানার জন্য! কয়েক জন সিপাহী বলছিল, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল বিদেশী অফিসার'দের বিরূদ্ধে, আর এবারের সিপাহী বিদ্রোহ হল, দেশী অফিসার'দের বিরূদ্ধে!!

কর্নেল তাহের'কে দেখলাম, বিদ্রোহী সিপাই পরিবেষ্টিত হয়ে আর্মি'র জীপ'এ চড়ে কোথায় চলে গেলেন। মানুষের প্রশ্নের উত্তরে কর্নেল তাহেরে'র ছোট ভাই বেলাল জানাল, যে কোন সময় রেডিও ষ্টেশনে জিয়া আসবে এবং তখন তাহের ভাই আর জিয়া মিলে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দিবেন। ভিড় কমে গেলে, আমরা কয়েক বন্ধু এলিফেন্ট রোড ধরে হাটতে হাটতে শাহবাগ মোড়ে গেলাম। গিয়েই শুনি কর্নেল তাহের ও খন্দকার মোস্তাক রেডিও ষ্টেশনে! রেডিও ষ্টেশনের সামনে দেখলাম বিরাট জটলা! মানুষজন বলাবলি  করছে, কর্নেল তাহের, খন্দকার মোস্তাক'কে রেডিও ষ্টেশন থেকে বের করে দিয়েছে!

বাসায় আসতে আসতে প্রায় ২-৩'টা বেজে গ্যালো। একটু পরে দেখি কর্নেল তাহের ৩৪৬ নম্বর বাসা (বাহার, বেলাল এর বন্ধু মিটী ভাই'দের বাসা) থেকে বের হয়ে আসছেন। মূখে চিন্তার ছাপ, সুসম্পষ্ট।  মিটি ভাই'কে জিজ্ঞেস করলে, বললেন, উনার টেপরেকর্ডার এর 'স্পুলে' কর্নেল তাহের ভাষন টেপ করে নিয়ে গ্যাছেন, যে ভাষন শহীদ মিনারে বা রেডিও ষ্টেশনে প্রচার করা হবে, কারন জিয়াউর রহমান আর আপাতত আসছেন না!

সন্ধার দিকে কর্নেল তাহের বাসায় বন্ধু টিংকু'র বড় ভাই গনবাহিনীর অন্যতম সংগঠক হাসানুল হক ইনু ভাই'কে প্রথম দেখলাম, সাথে আরো জাসদ/গনবাহিনী'র নেতারা। সবাই প্রচন্ড ব্যাস্ত। বাহার,বেলাল বন্ধুদের নিয়ে মোটর বাইকে ঝড়ের গতিতে আসা যাওয়া করছে। তখন মোবাইল ফোন আবিস্কারও হয় নি, কর্নেল তাহের'এর বাসার টি এন্ড টি ফোনই সম্ভবত  যোগাযোগের এক্ মাত্র উপায় ছিল! বাসার সামনের অবস্থা এবং রেডিও'র ঘোষনা থেকে ৮ নভেম্বর সকালেই মধ্যেই বুঝা গেল, বিপ্লব এর ফসল কর্নেল তাহের এর বদলে জিয়াউর রহমানে'র গোলায় উঠেছে!

**রোমান্টিক রেভূলশনারীঃ** আগামী ২১ জুলাই, কর্নেল তাহের এর ৩৪ তম মৃত্যু বার্ষিকী। মূক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সিরাজুল আলম খানের মত রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শে এসে, বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের (অব), মেজর জলিল (অব), ও কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ (অব), ফিদেল ক্যাস্ট্র'র মত জাতীয়তাবাদী থেকে সমাজতন্ত্রীতে পরিনত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার কিছু সময়ের মধ্যেই এই তিন সেক্টর কমান্ডার সেনাবাহিনী থেকে চাকুরীচ্যুত হন বা পদত্যাগ করেন। ৬০ এর দশক'এ কিউবা'র বিপ্লবে'র প্রভাব এ সারা পৃথিবীতে যে রোমান্টিক রেভূলশনারী ধারা'র সৃষ্টি হয়েছিল, তার ঢেউ আমাদের তীরেও এসে পৌচেছিল। যার ফলে আমদের দেশেও সৃষ্টি হয়েছিল ক্যাস্ট্রো আর চে'র মত, সিরাজ শিকদার, তাহের, জিয়াউদ্দিন, জলিল, নিখিল সাহা এবং আরো অনেক রোমান্টিক রেভূলশনারী।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল (অব), যোগদান করেন জাসদে এবং সভাপতির পদ পান। সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগের পর কর্নেল তাহের (অব) ড্রেজার সংস্তার চেয়ারম্যান (এবং একই সাথে গোপনে জাসদের গনবাহিনী'র প্রধান!) নিযূক্ত হন ও একই সাথে সেনা বাহিনী'র মধ্যে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' গড়ে তূলেন।

স্বাধীনতা পর সিরাজ সিকদার'এর মেধা এবং ব্যাত্তিতের কারনে কিছু মুক্তিযোদ্ধা তার দলেও যোগ দেন। তার মদ্ধে কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ(অব) বীর উত্তম, উল্লেখযোগ্য। পরে মতবিরধের কারনে তিনি সিরাজ সিকদার এর দল ত্যাগ করেন। পরে ৯০'র দশকে চট্টগ্রাম ওয়াসা'র চেয়ারম্যান পদে কিছুদিন কাজ করেন!!

**৭ই নভেম্বর এর সিপাহী বিদ্রোহঃ** রাত ১২টা থেকে ভোর পর্যন্ত বিদ্রোহের মূল নায়ক ছিলেন কর্নেল তাহের । তার অনূগত বিদ্রোহী সিপাহীদের পিছন পিছন বের হয়ে আসে, ৩রা নভেম্বরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাওয়া ট্যাংকগুলি এবং এর ফলে সাধারন মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সূযোগ সন্ধানীমোস্তাক গং এই বিভ্রান্তির ফায়দা লুটার চেষ্টা করে ( এই বিশৃংখল অবস্থায় ধূর্ত মোশ্তাক বেতারে ভাষন দিতে আসলে, এক পর্যায়ে কর্নেল তাহের 'আ'ল টিয়ার ইউর টাং' বলে হুমকি দিলে মোশ্তাক বেতার ভবন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়)। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কর্নেল তাহের, মোস্তাক এর নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লব ব্যার্থ করতে সক্ষম হলেও একই সাথে দুপুর বারোটার পর থেকেই, তার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, সেনাবাহিনী'র উপর থেকে তার নিয়ন্ত্রন দ্রুত কমতে থাকে।

এর প্রমান স্বরূপ আমারা দেখতে পাই, ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন এর ভাষ্যমতে রাতে বিদ্রোহের শুরুতে, সিপাহীদের শ্লোগান ছিল, 'সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই'!! কিন্তু ১৫ আগষ্ট অভ্যুথানে অংশগ্রহন কারী দুই ইউনিট, ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট ও বেঙ্গল ল্যান্সার বা ট্যাংক ইউনিট এর বিদ্রোহে যোগদানের ফলে সকালের দিকে শ্লোগান বদলে গিয়ে, 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ও 'নারায়ে তাকবীর' এ রূপান্তরিত হয়।

অশিক্ষিত ও উশৃংখল সৈনিকরা 'ক্লাস লেস আর্মী'র ধারনা কে 'অফিসার লেস আর্মী'র সাথে গুলিয়ে, অফিসার হত্যায় নেমে পড়ে। এই সূযোগে, প্রতিবিপ্লবীরা (ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন এর ভাষ্যমতে, ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট সৈনিক'রা) এরই মধ্যে তিন বীর মূক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফ, নাজমুল হুদা ও হায়দার' কে শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত এম পি হোষ্টেলের সামনেই নির্মম ভাবে হত্যা করে।

উশৃংখল সৈনিকরা শুধুমাত্র ব্যাক্তিগত আক্রোশে, কমপক্ষে আরও বেশ কয়েকজন সামরিক কর্মকরতা (একজন আর্মি লেডী ডক্টর, লে কর্নেল হামিদা, ডেন্টাল সার্জন করিম, ক্যাপ্টেন আনোয়ার, লেফটেন্যান্ট মোস্তাফিজ, মেজর আজিম) ও গুলশানে বীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরীর স্ত্রী সহ রামপুরায়  বাংলাদেশ টেলিভিশনের চার কর্মকতা কে হত্যা করে।

বিদ্রোহী সৈনিকরা কর্নেল মান্নাফ (পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) আর তার ব্রিগেড মেজর, মেজর তফসির আহমেদকে চরম ভাবে লাঞ্ছিত করে। অনেক অফিসার প্রানভয়ে আত্মগোপন করেন। বিদ্রোহের নেতা হিসাবে যার দায়ভার অনেকটা কর্নেল তাহের এর উপর ও বর্তায়। ফলে তিনি সেনাবাহিনী'র অফিসারদের কাছে আরো অগ্রহনযোগ্য হয়ে পড়েন।

**কর্নেল তাহের (অব) এর সীমাবদ্ধতাঃ** এক কালের পেশাগত সৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা ও পরবর্তী'তে সমাজতন্ত্রী কর্নেল তাহের, জাসদ নেতৃবৃন্দের কথায় যেমন খুব অনুপ্রানিত হয়েছিলেন, তেমনি তাদের অতিরঞ্জিত কথায় ও আশ্বাসে, খুব বিশ্বাস করেছিলেন। স্বল্প সংখ্যক অনুগত সৈনিক ছাড়া বাকী সেনাবাহিনী'তে কর্নেল তাহের এর তেমন কোন সমর্থন ছিল না, বললে ভুল বলা হবে না। একই সাথে জাসদ নেতৃবৃন্দ তাদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জনসমর্থন এর এক শতাংশ'ও রাজপথে নামাতে ব্যার্থ হন। তাই ক্যান্টনমেন্ট এর ভিতরে ও বাহিরের পরিস্থিতি'র নিয়ন্ত্রন দ্রুত কর্নেল তাহের'এর হাতছাড়া হয়ে যায়।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কর্নেল তাহের এর কাল হয়ে দাড়িয়েছিল। নির্মল সেন এর সাথে সাক্ষাতকারে ( কর্নেল তাহের এর ওয়েব সাইট'এ প্রকাশিত) তিনি দাবী করেছিলেন বা বিশ্বাস করতেন, তার কিছু হলে, সব ক্যান্টনোমেণ্ট এ বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে! কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই হয় নি।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর সিগন্যাল, সাপ্লাই ও কারনিক সিপাহী' দের মধ্যেই কর্নেল তাহের'এর 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র কার্যকলাপ ও প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। ১৫ আগষ্ট অভ্যুথানে অংশগ্রহন কারী দুই ইউনিট, ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট ও বেঙ্গল ল্যান্সার বা ট্যাংক ইউনিট, নিজেদের স্বার্থেই এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। তাদের আনুগত্য বরাবরই ছিল মোশ্তাক' এবং ফারুক-রশীদ গং এর প্রতি, তাহেরের প্রতি নয়। ৩রা নভেম্বর ফারুক-রশীদ গং দেশ ছাড়তে বাধ্য হলে তারা সামরিক নেতৃত্বহীণ হয়ে পড়ে এবং  এই দু'টি ইউনিট মোস্তাক কর্তৃক নিয়োজিত সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রতি স্বাভাবিক কারনেই আনুগত্য প্রকাশ করে। কারন জেনারেল সফিউল্লাহ'র স্থলে জেনারেল জিয়াউর রহমান'কে মোস্তাক গং'ই, সেনাপ্রধান নিযুক্ত করে।

সেনবাহিনী থেকে তিনবছর আগে রিটায়ার্ড ও সেনাবাহিনী'র সাথে সংশপর্সহীণ, 'ক্লাস লেস আর্মী'র  প্রবক্তা কর্নেল তাহের'এর সমর্থন, এমনিতেই অফিসার পর্যায়ে ছিল প্রায় শূন্যের কাছে। শুধু মাত্র মেজর জিয়াউদ্দিন (শরনখোলা থানা আক্রমনের নেতা, বর্তমানে চিংড়ি ব্যাবসায়ী, যিনি দূবলা'র চরের জিয়াউদ্দিন নামে পরিচিত) ছাড়া আর কোন সামরিক অফিসার'কে তিনি দলে টানতে পারেন নি! নিয়ন্ত্রনহীন, উশৃংখল সৈনিকদের, অফিসার হত্যায় ফলে কর্নেল তাহের, সেনাবাহিনী'র অফিসারদের কাছে একেবারে অগ্রহনযোগ্য হয়ে পড়েন। তাহেরের পা'র নিচ থেকে খুবই দ্রুত, মাটি সরে যেতে থাকে। জাসদের গনবাহিনী 'কাগুজে বাঘে' বলে প্রতিয়মান হয়।

খালেদ মোশাররফের মত তাহের'ও রেডিও তে ভাষন না দিয়ে, ব্যাপক পরিচিত হওয়ার বা তার উদ্দেশ্য প্রচারের সবচেয়ে বড় সুযোগ'টি হেলায় হারান! সি জি এস হিসাবে খালেদ মোশাররফের সেনবাহিনীতে ব্যাপক ও জনসাধারনের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিচিতি থাকলেও, সেনবাহিনী থেকে তিনবছর আগে রিটায়ার্ড তাহের'এর পরিচিতি শুধুমাত্র তার সমর্থকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিপ্লব সফল করার জন্য, তার বিপ্লবের আদর্শ বা উদ্দেশ্য কি ছিল, তা অনান্য ক্যান্টনমেন্ট এর সিপাহীদের এবং জনসাধারন'এর কাছে পৌছানোর খুবই প্রয়োজন ছিল।

এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই, তাহেরের কথা অনুসারে, জিয়াউর রহমান রেডিও ষ্টেশনে না গিয়েও (যেহেতু রেডিও ষ্টেশন ক্যান্টনমেন্ট'এর বাইরে এবং তা দুপুর পর্যন্ত তাহের'এর সমর্থকদের নিয়ন্ত্রনে ছিল), পরে তার ভাষন টেপ করে প্রচারের জন্য রেডিও ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেন। রেডিও তে নাম প্রচারের সুফল যে কতটা ফলপ্রসু, তা ৭১ সালে'ই জিয়াউর রহমান বুঝেছিলেন। জিয়াউর রহমান তার ভাষন 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে শুরু করেন এবং 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' দিয়ে শেষ করেন, এবং একই সাথে তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে দেন।

**ক্ষমতার লড়াই ও তাহের'এর হিসাবে গড়মিল!** সামরিক বাহিনীর রিটায়ার্ড স্মার্ট অফিসার কর্নেল তাহের, যে কোন হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন, ততকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া তার কথামত চলবে তা'র হিসাব মিলানো সত্যিই অসম্ভব! সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনী'তে তাহের থেকে অনেক অনেক বেশী পরিচিত এবং জনপ্রিয় ছিলেন। 'আর্মীর চেইন অফ কমান্ড' অনুযায়ী সব অফিসার, সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া'র কমান্ড ফলো করতে বাধ্য ছিল। অন্যদিকে যূদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা তাহের এর ব্যাপারে কারো কারো সহানুভূতি থাকলেও, তার বিপ্লবের প্রতি কারো কোন সমর্থন ছিল না।

জেনারেল জিয়াউর রহমান, প্রথমে তাকে উদ্ধার করার জন্য কর্নেল তাহের এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও, নিজের অবস্থা সংহত করার পর থেকেই স্বাভাবিক কারনেই জেনারেল জিয়াউর রহমান, কর্নেল তাহের এর সাথে দূরত্ব বজায় রাখেন। জিয়া হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর, কর্নেল তাহের আবার বিদ্রোহের চেষ্টা চালাতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে কর্নেল তাহের ঢাকা ইউনিভার্সিটি'র এস, এম হল এর হাউস টিউটর এর বাসা এবং হাসানুল হক হাতিরপুল এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হন।

পরবর্তী'তে জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক গঠিত সামরিক ট্রাইবুনাল কর্নেল তাহের কে দোষী সাবস্ত্য করে এবং ১৯৭৬ সালের ২১ এ জুলাই ঢাকা সেন্ট্রাল জেল'এ এই ফাঁসী কার্যকর করা হয়। এভাবেই জেনারেল জিয়াউর রহমান'কে সামনে রেখে, কর্নেল তাহেরের মাধ্যমে জাসদের ক্ষমতা দখলে'র ফর্মূলা ব্যার্থ প্রমানিত হয়। আর এই এক্সপেরিমান্টের মূল্য হিসাবে দিতে হয় কর্নেল তাহেরের জীবন।

ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন এর ভাষ্যমতে তাহের এর প্লান ছিল, অফিসার হত্যার মধ্য দিয়ে আর্মীর চেইন অফ কমান্ড' ধ্বংস করে, আর্মী'র নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেওয়া, (এবং পরবর্তীতে সুবিধাজনক অবস্থায় জেনারেল জিয়া'কে হত্যা করা)। প্রাক্তন আর্মী ইন্টিলিজেন্স অফিসার, সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া'র পক্ষে সে উদ্দেশ্য বুঝতে খুব একটা দেরী হয় নাই, তাই সময় মতো, জিয়াই, তাহের'কে ফাঁসি'তে ঝুলিয়ে দেন। তাহের যেহেতু অনেকটা 'ওয়ান ম্যান শো' ছিলেন, তাই তার মৃত্যূর মধ্য দিয়ে তার স্বপ্নের সমাধি ঘটে। তার বিপ্লব অসমাপ্ত'ই থেকে যায়।

জাসদ এর ভাষ্য ও দাবী অনূযায়ী, 'তাহের জিয়া'র প্রান রক্ষা করেন এবং জিয়া তার প্রতিদানে তাহের এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং পরবর্তী'তে তাহের'কে ফাঁসি দেন"! ব্যাপারটা'কি আসলে তাই! মোটেই তা নয়। খালেদ মোশাররফ এবং শাফায়াত জামিল, চাইলে ৩রা নভেম্বরেই জিয়াউর রহমান'কে হত্যা করতে পারতেন। তারা শুধু জিয়াউর রহমান'কে গৃহবন্দী করে রাখেন। তাই জিয়াউর রহমান'এর প্রান রক্ষা করার দাবী ধোপে টিকবে না। আর জিয়াউর রহমান'কে মুক্ত

করার দাবীদার ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট এর সৈনিক'রা। তবে তাহেরের সিপাহী বিদ্রোহ যে, সেই মুক্ত করার পরিবেশ ও সুযোগ তৈরী করে দিয়েছিল তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

**জেনারেল জিয়াঃ** আসাধরন ইন্টুইসন, দ্রুত পরিস্থিতি অনুধাবন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকারী ও স্মার্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্ত হবার পর সরাসরি তার প্রতি অনুগত ২ ফিল্ড রেজিমেন্টে চলে যান এবং নিজস্ব অবস্থান সুসংহত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট রশীদের নেতৃত্বে, ১৫ আগষ্ট অভ্যুত্থানে অংশগ্রহন কারী দু'টি ইউনিটের একটি, অন্যটি ফারুকের নেতৃত্বাধীণ বেঙ্গল ল্যান্সার বা ট্যাংক ইউনিট। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, ৩ রা নভেম্বরের অভ্যূথানে, খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিলের নেতৃতে ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের ১ম, ২য় ও ৪ বেঙ্গল অংশগ্রহন করে। অভ্যূথান ব্যার্থ হয়ে যাওয়াতে, এই তিনটি ইউনিট নিস্ক্রীয় হয়ে পড়ে। ফলে ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট ও বেঙ্গল ল্যান্সার বা ট্যাংক ইউনিট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর মূল চালিকা শক্তি'তে পরিনত হয়!

**ফাইনেস্ট মোমেন্ট অফ জেনারেল জিয়াঃ** এই রকম এক চরম ঘোলাটে অবস্থায়, সেনা অফিসারদের এক সমাবেশে জেনারেল জিয়াউর রহমান সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে পরিস্থিতি' সামাল দেন এবং সেনবাহিনী'কে (এবং দেশ'কে) চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। জিয়াউর রহমান'এর কোর্সোমেইট এবং ততকালীন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর লগ এরিয়া কমান্ডার, লে কর্নেল হামিদ, পি, এস, সি'র ভাষ্য অনুযায়ী, সেনা অফিসারদের উদ্দেশ্যে এক সভায় জেনারেল জিয়াউর রহমান বলেন, 'ডোণ্ট রান, ইফ ইউ রান, দে উইল চেইস ইউ, এক্ট লাইক আন অফিসার এন্ড সেইফ দ্য নেশান"।

নিরপেক্ষ বিচারে ৭'ই নভেম্বর হচ্ছে জেনারেল জিয়াউর রহমান'এর জীবনে'র চরম ও উজ্জলতম ক্ষন। ১৯৭১ সালে 'সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায়' থাকার কারনে প্রথম সামরিক অফিসার হিসাবে জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা পাঠ করেন, যা মানুষকে সাহস জোগায়। সেখানে মেজর রফিক বা মেজর সফিউল্লাহ ঘোষনা পাঠ করলেও, ফলাফল একি হতো, দেশ একই দিনে, ১৬ ডিসেম্বর'ই স্বাধীন হতো, কোন হেরফের হতো না।

অন্যদিকে ৭ নভেম্বর, জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন সেনাপ্রধান। একদিকে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা নিহত। অন্যদিকে জেনারেল সফিউল্লাহ অপসারিত, সি জি এস খালেদ মোশাররফ ও কে এন হুদা নিহত। একদিকে নেতৃত্বে চরম শূন্যতা এবং অন্যদিকে সিপাহী বিদ্রোহ কর্নেল তাহেরের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গ্যাছে, যে কোন সময় অনান্য ক্যান্টনমেন্ট গুলিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ঠিক সেই সময় জেনারেল জিয়াউর রহমান'এর সঠিক নেতৃত্ব দেশকে অনেক প্রানহানি ও চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাচায়। ৭ নভেম্বর, জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহসের সাথে সেনা অফিসারদের নেতৃত্ব না দিলে, দেশের নেতৃত্ব, প্রথমে (লাইবেরিয়া'র মত) অশিক্ষিত ও উশৃংখল সৈনিক'দের হাতে চলে যাওয়ার এবং পরে গৃহযূদ্ধ শুরু হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

**জাসদের হঠকারী ও অদূরদর্শী রাজনীতিঃ** জাসদের স্বপ্নদ্রষ্টা বা মূল হোতা, সিরাজুল আলম খানের মত মেধাবী, তাত্তিক কিন্তু বিপদ্গামী, ক্ষমতা লিপ্সু এবং হঠকারী নেতাদের কারনে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে (১৯৭২ - ১৯৭৫), অনেক প্রতিভাবান যুবক অকারনে জীবন বিসর্জন দিয়েছিল (কর্নেল তাহের এর ওয়েব সাইট'এ 'প্রেরনা'র মুখ' দেখুন)। তাদের গন বাহিনীর মত সংগঠন এ যোগ দিয়ে অকারনে জীবন ও ভবিষ্যত বিসর্জন দিয়েছিল হাজার হাজার সম্ভাবনাময় তরুন ও যুবক। একই সাথে মেধাবী ও ক্ষমতালোভী এই তাত্তিক নেতা, নিজের ও দলের সীমাবদ্ধতা, বাংলাদেশের মানুষের মন মানসিকতা,সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় প্রভাব বুঝতে ব্যার্থ হয়েছিলে। তাই তাদের শ্রেনী সংগ্রাম এর স্বপ্ন এই দেশের মাটিতে কখনোই দৃঢ় শেকড় গাড়তে পারেনি

সিরাজুল আলম খান ও তার অনূসারীগন, স্বাধীনতার পর থেকেই নিজেদের ওভার এস্টিমেট করেছিলেন। তারা সব কিছুই তাড়াহুড়া করতে গিয়ে বার বার নিজেদের দলের বিপর্যয় ডেকে আনা ছাড়াও, সদ্য স্বাধীণ দেশে আস্থির পরিস্থিতি'র সৃষ্টি করেছিলেন। একই সময়ে জাসদের, বঙ্গবন্ধু'র মত নেতাকে চ্যালেঞ্জ করার মধ্য দিয়ে নিজেদের দূর্বলতা বা সীমাবদ্ধতাই জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে! একই সময়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত মৌলবাদী শক্তিও তাদের 'সেল্টারে' এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই আমরা দেখতে পাই, জিয়াউর রহমান, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি'র অনুমূতি দেওয়ার পর থেকেই জাসদের জনসমর্থন কর্পূরের মত উবে যায়।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরন দেয়া যেতে পারে। ১৯৭৪ এ কুচক্রী মোশ্তাক ও ক্ষমতালোভী মনি'র কুপরামর্শে বঙ্গবন্ধু তার সবচেয়ে মেধাবী ও যোগ্য সহকর্মী তাজউদ্দিন আহমেদ'কে আবমূল্যায়ন করে দূরে সরিয়ে দেন।  নির্লোভ ও বুদ্ধিমান  তাজউদ্দিন আহমেদ' কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে চ্যালেঞ্জ করেন নাই। ৩রা নভেম্বর জেলহত্যা'র শিকার না হলে, বঙ্গবন্ধু'র অবর্তমানে তাজউদ্দিন আহমেদ'ই যে আরো একবার আওয়ামী লিগের হাল ধরতেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা আরো দেখতে পাই মাও সেতুং এর সাথে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও শূধু মাত্র ধৈর্য্য ধরার কারনে,দেং জিয়াও পিং,  (এক যুগ এর পরে মাও সেতুং, এর মৃত্যুর পর) তার অনূসারীদের নিয়ে চীনের নীতি নির্ধারক হন!

সিরাজুল আলম খান ও তাদের অনূসারীগন, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ'এ অনেক গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারতেন। আওয়ামী লিগে ত্যাগ না করলে, ৭৫ এর আগে তারা মোস্তাকের মত প্রতিক্রিয়াশীল'দের বিপক্ষে তাজুউদ্দিন আহমেদ এর মত প্রগতিশীল নেতাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখতে পারতেন। আর ৭৫ এর ট্রাজেডির পর, নিশ্চিত ভাবে তারাই হতে পারতেন (রাজ্জাক-তোফায়েল এর জায়গায়) আওয়ামী লিগের কান্ডারী। দেং জিয়াও পিং এর মতো, সিরাজুল আলম খান ও তার অনূসারীদের, হয়তো এত বছর অপেক্ষা করতে হতো না।

সিরাজুল আলম খান (এক সময় দাদা নামে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় থাকলেও, পরবর্তীতে তার হঠকারী ও ধংস্বাত্মক কার্যকলাপ'এর জন্য'কাপালিক' নামেই বেশী পরিচিতি পান), বীর মুক্তি যোদ্ধা কর্নেল তাহের (অব) বীর উত্তম কে ফাঁসির মঞ্চের দিকে ঠেলে দিয়ে, হাজার হাজার মেধাবী তরুন, যুবকের জীবন, মেধা ও সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটিয়ে (, এখন স্বাভাবিক(!) জীবন যাপন করছেন।

কর্নেল তাহেরের আগে, সকলের অলক্ষ্যে, জাসদের অনূসারী আরেক দেশপ্রেমিক,  বুয়েটের লেকচারার, নিখিল সাহা ২৬ নভেম্বর ১৯৭৪ এ প্রান দেন। নিখিল সাহা, তার উদ্ভাবিত গ্রেনেড, যা 'নিখিল বোমা' নামে গনবাহিনী'র মধ্যে জনপ্রিয় ছিল, তা'র চূড়ান্ত পরীক্ষা কালে (জার্মানী'তে পি এইচ ডি করতে যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে) বিস্ফোরনে নিহত হন। মেধার কি দারুন অপচয়!

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস,  সিরাজুল আলম খান'এর যেই অনূসারীগন, যেমন রব, ইনু,বেলাল (৭২-৭৫) বঙ্গবন্ধুর চরম বিরোধীতা করেছিলে। তারাই নিজেদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরে দুই যূগ পরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কৃপা'য় মন্ত্রী, এম পি হয়ে জীবনের চরম সার্থকতা খুজে পেয়েছেন!!

**এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কাহিনীঃ** বীর মুক্তি যোদ্ধা কর্নেল তাহের (অব) বীর উত্তম এর আদর্শ ও দেশপ্রেম অনেক মেধাবী তরুন, যুবককে অনুপ্রানিত করেছিল, যেমনটি করেছিল তার তিন সহোদরকে। কর্নেল তাহের পরিবার'ই বাংলাদেশ'এর একমাত্র পরিবার যা'র চার চারজন সদস্য, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করে বীরত্বের জন্য খেতাব পেয়েছেন।

বীর মুক্তি যোদ্ধা কর্নেল তাহের (অব) বীর উত্তম এর অনুজ, ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল বীর প্রতীক, এক সময়ের জাসদের গনবাহিনীর সক্রিয় জানবাজ সদস্য, অনেক ঘাত প্রতিঘাত (প্রথমে ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেন কে অপহরনের চেষ্টাকালে আহত এবং পরে কারাবাস,' ৮০'র দশকে লেবানন এ ইসরাইলী আগ্রাসনের বিরূদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) অতিক্রম করে মুক্তিযূদ্ধের মূলধারায় ফিরে এসেছেন। তিনি এখন জাতীয় সংসদে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য।

অন্য দুই সহোদর প্রয়াত আবু ইউসুফ খান, বীর বিক্রম ও সাখাওয়াত হোসেন বাহার, বীর প্রতীক (কর্নেল তাহেরকে মুক্ত করার জন্য ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেন কে অপহরনের চেষ্টাকালে আরো তিনজন এর সাথে নিহত), খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তি যোদ্ধা।

কর্নেল তাহের গ্রেফতার হওয়ার পরে জাসদ বা তার গনবাহিনী'র ভিত্তি যে কতটা দূর্বল তা জনসমক্ষে চলে আসে। শুধুমাত্র, তাহের এর দুই ভাই ও তাদের চার গনবাহিনী'র বন্ধু মিলে ২৬ নভেম্বর, ৭৫ ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেন কে অপহরনের মাধ্যমে জিম্মি করে, 'মুক্তিপন হিসাবে' কর্নেল তাহের'কে মুক্ত করার ব্যার্থ চেষ্টা করেন।

**শেষ স্মৃতিঃ** ২৬ নভেম্বর সকালে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলে ক্লাস নাইন'এর ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে দেখি, সব সময় টি শার্ট পরা দুই ভাই, বাহার ও বেলাল, 'স্যুট' পরে মোটর সাইকেল স্টার্ট দিচ্ছে! আমি কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলে, বাহার হেসে ফ্যালে আর আমি স্কুলে পথে পা চালাই। পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরার সময়, কর্নেল তাহের এর উপর তলা'র বারান্দা থেকে তুহিন জানাল, "ওই শুনছস, ইন্ডিয়ান হাইকমিশনে বাহার মারা গ্যাছে"! দুপুর বারোটার খবরে শুনলাম, ইন্ডিয়ান হাইকমিশনে'এর সেই মিশনে বাহার সহ চারজন নিহত হয়, আহত অবস্থায় বেলাল ও আর একজন ধরা পড়ে। আজো মনে পড়ে, মৃত্যুর ঘন্টাখানেক আগে বাহারের সেই হাসির কথা!

**ইতিহাসের শিক্ষাঃ** রাজনৈতিক'দের নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এবং রাজনৈতিক প্রতিদন্ধী'দের ক্ষমতা ও গ্রহনযোগ্যতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা থাকা এবং সেই সঙ্গে দেশ ও মানুষের মন মানসিকতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় প্রভাব বুঝতে পারাটা যে কত জরুরী তা কর্নেল তাহের'এর মর্মান্তিক পরিনতী'ই স্মরন করিয়ে দেয়। শুধু মাত্র সৎ ও দেশপ্রেমিক হলেই যে, কোন রাজনৈতিক' বা তার মতবাদ সাধারন মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে, এমন কোন গ্যারান্টি নাই। বাংলাদেশ'এ বিশেষত চরম ডান বা বাম দলের আবেদন কোণ কালেই গ্রহনযোগ্য হয় নাই।

কর্নেল তাহের'এর নেতৃত্বে সিপাহীরা যে দাবী পেশ করে, জিয়াউর রহমান তার কিছু কিছু মেনে নেন এবং ফলে সিপাহীদের মধ্যে জিয়াউর রহমান'এর গহনযোগ্যতা অনেক বেড়ে যায়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, কর্নেল তাহের ও কর্নেল জিয়াউদ্দিন দুজনেই স্বাধীনতার পর পর কুমিল্লা ও ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন। এই দুই চৌকষ মুক্তিযোদ্ধা অফিসার পদত্যাগ না করে, সেনা বাহিনীতে থেকে চেষ্টা করলে সেনাবাহিনী'র মধ্যে আরো অনেক সহজে, অনেক আগেই, সব না হলেও, কিছু দাবী পূরন করা সম্ভব হতো।

যদিও বলা হয়ে থাকে, কোন আত্মদান'ই বৃথা যায় না, কথাটা কতটুকু সত্য  তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু ইতিহাস প্রমান করে যে ভুল নেতৃত্বের নির্দেশনার জন্য অনেক আত্মত্যাগ'ই অপচয় এর কাছাকাছি পর্যায়ে চলে যেতে পারে। কর্নেল তাহের'এর, 'মত ও পথ' নিয়ে অনেক বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য তার ও তার পরিবারের সততা, ভালবাসা ও আত্মত্যাগ নিয়ে কোন তর্কের অবকাশ নাই।

**পাদটীকাঃ** ৭০-৮০'র দশকে ঢাকা'র দেয়ালে জাসদের লিখন ছিল, " বিপ্লব ধ্বংসের তান্ডব লীলা নয়, সৃষ্টির প্রসব বেদনা (ডেলিভারী পেইন) মাত্র"! সিরাজুল আলম খানের ব্রেইন চাইল্ড, জাসদ, অনেক অমূল্য প্রান ধ্বংস করলেও, অরাজকতা এবং রব, শাজাহান সিরাজ, ইনু'র মত ধান্দাবাজ রাজনীতিবিদ ছাড়া আর কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন নাই। সিরাজুল আলম খানের মত হাতুড়ে ডাক্তারের ভূল প্রেশক্রিপশনে'র ফলে, বার বার জাসদের নরমাল ডেলিভারী'র বদলে মিসক্যারেজ হয়েছে। সেই মিসক্যারেজ এর রক্তক্ষরন হিসাবে ঝরে গ্যাছে, কর্নেল তাহের, নিখিল সাহা'র মত অজস্র দেশপ্রেমিক'দের জীবন।

তথ্য সূত্রঃ
১। বাংলাদেশঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১; ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
২। ৭৫ এর তিনটি অভ্যূথ্যানঃ লে কর্নেল আব্দুল হামিদ
৩। বাংলাদেশ, দ্য আন ফিনিশড রেভূলশন, লরেন্স লিফস্যুলজ
৪। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর, মেজর জেনারেল মুহম্মদ ইব্রাহীম
৫। কর্নেল তাহের ওয়েব সাইট  http://www.col-taher.com/
৭৫ এ প্রতক্ষ্যদর্শী, লেখক

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ১২ জুলাই, ২০১০, সিডনী,